গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dpdt.gov.bd

স্মারক নং : ৩৬.০৮.০০০০.৬০০.০৬.০০২.১৮. ৪০৯ তারিখ: ১৮/০১/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জার্নাল নং-০৯ ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) জিআই জার্নালের কপি বিতরণ।

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢকা হতে প্রকাশিত ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) **"ঢাকাই মসলিন"** জার্নাল নং-০৯ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রচার ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে
জিআই জার্নাল নং-৯ এর .... কপি।

(মোঃ আবদুস সাত্তার)
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৫৬০৬৯৬
registrar@dpdt.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
২। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। সভাপতি, ডিসিসিআই, ডিসিসিআই বিল্ডিং, ৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাতাঁবো, ঢাকা।
৬। সভাপতি, এমসিসিআই, চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, চেম্বার ম্যানসন, (৩য় তলা), ৫ কে.ডি.এ. বা/এ, খুলনা।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, ডিপিডিটি, ঢাকা।(website এ প্রকাশের জন্য)।
৯। লাইব্রেরীয়ান, ডিপিডিটি, ঢাকা।(লাইব্রেরীতে ক্রমানুযায়ী সংরক্ষণের জন্য)।

Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

JOURNAL

November, 2020

GI Journal No. 09

Published on :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। **আবেদনপত্র ঃ**

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। **ফি ঃ**

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। **ভাষা ঃ**

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। **আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৩০
আবেদনের তারিখ : ০২-০১-২০১৮

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাতাঁবো কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং-৩০ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "ঢাকাই মসলিন" যা শ্রেণি ২৪ ও ২৫ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "ঢাকাই মসলিন"।

শ্রেণি ঃ ২৪ ও ২৫

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাতাঁবো, ঢাকা।

খ) ঠিকানা ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, The Golden Heritage of Bangladesh (1st Phase)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্যতীত প্রকৃত মসলিন কাপড় অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে না। কাজেই বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড একই সাথে ঢাকাই মসলিন উৎপাদনকারী এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে ঢাকাই মসলিন কে আবেদনকারী হিসাবে ঘোষণা করছে। ঢাকাই মসলিন এর GI প্রাপ্তির পর সরকার এটি প্রাইভেট সেক্টরে ব্যাপক উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে। তখন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সুপারিশ/প্রত্যয়নক্রমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ঢাকাই মসলিন উৎপাদনকারীগণের নিবন্ধন প্রদান করবে।

ঘ) প্রকার ঃ টেক্সটাইল এন্ড ক্লোদিং।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন শৈলী ও নকশার পার্থক্যে মসলিনকে আলাদা করা হতো। ১৯৬৫ সনে রচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম “ঢাকাই মসলিন” গ্রন্থে ১৮ প্রকার মসলিনের বর্ণনা করেছেন। কাজেই প্রকারভেদ অনুযায়ী ঢাকাই মসলিনের স্পেসিফিকেশন ভিন্ন ভিন্ন হবে।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

ঢাকাই মসলিন শুধু একটি নাম নয়; একটি কিংবদন্তি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজসিক আভিজাত্যের সাক্ষী। এটি আপন মহিমায় সৌন্দর্য ও শিল্প নৈপুণ্যে অনন্য এবং অনবদ্য। বাংলার ঢাকাই মসলিনের আকর্ষণীয় ও রুচি স্নিগ্ধ নামের আড়ালে রাজসিক আভিজাত্যের ছাপ পাওয়া যায়।

ঢাকাই মসলিন হচ্ছে ফুটি কার্পাস তুলায় চরকার মাধ্যমে উৎপাদিত সুতা দিয়ে গর্ত (পিট) তাঁতে তৈরি এক ধরনের সূক্ষ্ম/পাতলা সুতি কাপড়; যা ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় উৎপাদিত হতো। এটি পেইন বা সাধারণ বুননে তৈরি হত। অন্যভাবে বলা যায়, ঢাকাই মসলিন হলো ফুটি কার্পাস তুলার আঁশ থেকে প্রস্তুত করা এক প্রকারের অতি সূক্ষ্ম কাপড়। ঢাকাই মসলিন ছিল নানা রকমের। এর পার্থক্য নির্ণীত হত সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন আর নকশা বিচারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতার তৈরি, সবচেয়ে কম ওজনের মসলিনের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি, দামটাও ছিল সবচেয়ে চড়া। মলবুস খাস ও মলমল খাস ছিল সবচেয়ে নামী, সেরা মসলিন। সম্রাটের জন্য তৈরি হত এই মসলিন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় মসলিন কাপড়ের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। তখন বাংলাদেশে একধরনের উন্নত জাতের কার্পাস তুলা (ফুটি কার্পাস) উৎপাদিত হত। সে কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরি হত মসলিনের সুতা। বাংলা মসলিন শব্দটি আরবি, ফারসি কিংবা সংস্কৃতমূল শব্দ নয়। এস.সি. বার্নেল ও হেনরি ইউল নামের দুজন ইংরেজ কর্তৃক প্রকাশিত অভিধান **“হবসন জবসন”** এ উল্লেখ করা হয়েছে মসলিন শব্দটি এসেছে ‘মসূল’ থেকে। ইরাকের এক বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র হলো মসূল। এই মসূলেও অতি সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হত। এই মসূল এবং সূক্ষ্ম কাপড় এ দুয়ের যোগসূত্র মিলিয়ে ইংরেজরা বাংলার অতিসূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দেয় ‘মসলিন’। অবশ্য বাংলার ইতিহাসে ‘মসলিন’ বলতে তৎকালীন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত সূক্ষ্ম কাপড়কে বুঝানো হত, যা মোঘল আমলে ১৭ শতকে ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছিল।

ছ) ঢাকাই মসলিনের প্রকারভেদ ঃ

সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন শৈলী ও নকশার পার্থক্যে মসলিনকে আলাদা করা হত। ১৯৬৫ সনে রচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম "ঢাকাই মসলিন" গ্রন্থে মসলিনের নিম্নোক্ত প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন ঃ

মলমল খাস ঃ

প্রকৃতপক্ষে মোঘল আমলের মলবুস খাসই আঠার শতক এবং তার পরবর্তী সময়ে মলমল খাস নামে পরিচিত ছিল। আঠার শতক থেকে মলমল খাস নামে একটি ভিন্ন প্রকারের মসলিন তৈরি হত, এবং এ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হত। মলমল খাস-এ ১৮০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সুতা ব্যবহৃত হত এবং সাধারণ মলমল খাস আধা টুকরায় তৈরি হত, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য ছিল ১০ গজ এবং প্রস্থ ১ গজ। মোঘল আমলে এ কাপড় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল, এত সূক্ষ্ম যে এর ওজন ৬/৭ তোলার বেশী ছিল না এবং একে ছোট অঙ্গুরীয়ের ভিতরে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেত। ১৮৫১ সালে বিলাতের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে এ জাতীয় যে মসলিন খানি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তার ওজন ছিল আট তোলা। আঠার শতকে মোঘল বাদশাহের জন্য তৈরি মলবুস খাস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও কম মিহি নানা রকমের মলমল খাস তৈরি হত। সেগুলো দামেও অনেক সস্তা ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রপ্তানীকৃত মলমল লঙ্গ ইত্যাদি নামে বিভক্ত ছিল এবং এদের সুতার সংখ্যা ১২০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ও দাম ৭//০ থেকে ৪৭ টাকা পর্যন্ত উঠানামা করত।

ঝুনা ঃ

জেম্‌স টেলর মনে করেন যে ঝুনা শব্দটি হিন্দি শব্দ ঝিনা (অর্থ- সূক্ষ্ম বা সরু) থেকে উদ্ভূত। ঝুনা কাপড় এত সূক্ষ্ম ছিল যে এ কাপড় পরিধান করলেও দেহ নগ্ন প্রায় থাকত এবং কম সংখ্যক সুতা ব্যবহৃত হওয়ায় এক একটি সূক্ষ্ম জালের মত দেখাত। এটি দৈর্ঘ্যে ২০ গজ এবং প্রস্থে ১ গজ ছিল এবং এতে প্রায় ১০০০ সুতা থাকত এবং এর ওজন প্রায় ২০ তোলা ছিল। মোঘল আমলে এর বিশেষ প্রচলন ছিল। ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়র উল্লেখ করেছেন যে, ঝুনা কাপড় বিদেশী বণিকদেরকে রপ্তানী করতে দেয়া হতনা এবং সাধারণত এগুলো মোঘল দরবারে পাঠানো হত। ধনী ও বিত্তশালী দেশীয় লোকদের হারেমের মেয়েদের ঝুনা কাপড় ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। নওয়াব বাদশাহ্ বা বড় বড় আমীর ওমরাহদের মহীষিরাও গরমের মৌসুমে ঝুনা মসলিনের জামা তৈরী করতেন। নর্তকী ও গায়িকারাও ঝুনা কাপড় পরত।

রঙ্গ ঃ

রঙ্গও ঝুনার মত জালী মসলিন। এতে ১২০০ সুতা থাকত এবং এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ ও চওড়া ১ গজ ছিল এবং এর ওজন প্রায় ২০ তোলা ছিল।

আব-ই-রওয়ান ঃ

ফার্সী শব্দ আব (পানি) এবং রওয়ান (প্রবাহিত) থেকে আব-ই-রওয়ান নামের উৎপত্তি। এ কাপড় এত সূক্ষ্ম ও পাতলা বুননী বিশিষ্ট ছিল যে ঢাকার তাঁতিরা "আব-ই-রওয়ান" বা "প্রবাহিত পানি" নাম দিয়ে এর সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষের প্রমাণ করত। বিদেশেও আব-ই-রওয়ান এর বিশেষ নাম ছিল এবং বিদেশী বণিক কোম্পানিরা অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম আব-ই-রওয়ান প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করত। আব-ই-রওয়ান সাদা জমিনে নকশা বিহীন (plain) মসলিন এবং এর দ্বারা পরিধেয় জামা ইত্যাদি তৈরি হত। এ কাপড় লম্বায় ২০ গজ এবং চওড়ায় ১ গজ ছিল এবং সুতার সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত উঠানামা করত। এর ওজন ছিল প্রায় ২০ তোলা। ১৭৭০ সালে উইলিয়াম বোল্ট তাঁর Consideration on Indian Affairs এ লিখেছেন যে ঢাকাবাসীরা আব-ই-রওয়ান সম্পর্কে দুটি মুখরোচক গল্প বলতেন। ১ম, একবার সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মেয়েকে নগ্নদেহে থাকার জন্য ভর্ৎসনা করেন। রাজকন্যা তখন প্রতিবাদ করে বলেন যে তিনি তখন সাতটি জামা পরিহিত ছিলেন। ২য়, একদিন একখানি আব-ই-রওয়ান ঘাসের উপর শুকাতে দেওয়া হয়। কোন এক কৃষকের গরু ঐ মাঠে চড়তে গিয়ে বহুমূল্য আব-ই-রওয়ানখানি সমেত ঘাস খেয়ে ফেলে। এ অপরাধে রূষ্ট হয়ে নওয়াব আলীবর্দী খান কৃষককে ঢাকা থেকে বের করে দেন।

সরকার-ই-আলি ঃ

প্রথম যুগে সরকার-ই-আলি কোন বিশেষ ধরনের কাপড়ের নাম ছিলনা; মোঘল সম্রাটের জন্য তৈরি মসলিনকে যেমন সম্মান সূচক মলবুস খাস নাম দেওয়া হয়েছিল, বাংলার নওয়াবের জন্য তৈরি মসলিনকেও তেমনি সম্মান করে সরকার-ই-আলি বলা হত। বাংলার নওয়াবের সরকার-ই-আলি নামধারী জায়গীরের প্রাপ্য খাজনা থেকে মসলিন-এর মূল্য পরিশোধ করা হত বলেই হয়ত মসলিন-এর নামও সরকার-ই-আলি রাখা হয়েছিল। কিন্তু মলমল খাস-এর ন্যায় পরবর্তী কালে সরকার-ই-আলি নামধারী বিশিষ্ট প্রকারের মসলিনও তৈরি করা হত। সরকার-ই-আলি অত্যন্ত মিহি বুননী বিশিষ্ট ছিল এবং সূক্ষ্মতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটিও সাদা জমিন বিশিষ্ট (plain) ছিল এবং পরিধেয় জামা ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হত। এটি দৈর্ঘ্যে ১০ গজ এবং চওড়ায় ১ গজ ছিল; এর সুতার সংখ্যা ছিল ১৯০০ এবং ওজন ছিল প্রায় ১০ তোলা।

খাস্‌সা ঃ

খাস্‌সা ফার্সী শব্দ এবং এর দ্বারা অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম মসলিনকে বুঝায়। এ কাপড় ঘন বুননীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীতে'। ঐ সময় সোনারগাঁও কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। আঠার ও উনিশ শতকে খাস্‌সা মসলিনের মধ্যে জঙ্গল খাস্‌সা সর্বোৎকৃষ্ট বলে পরিচিত ছিল এবং জঙ্গলবাড়ীর তাঁতিরা এর বুননের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইংরেজ কোম্পানীর কাগজপত্রে এক কুষা [খাস্‌সার বিকৃত রূপ] বা জঙ্গলকুষা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ এবং চওড়া ১ গজ ছিল, এর সুতার সংখ্যা ১৪০০ থেকে ২৮০০ পর্যন্ত উঠানামা করত। ২৮০০ সুতা বিশিষ্ট একখানি জঙ্গল খাস্‌সা মসলিনের ওজন ছিল প্রায় ২০ তোলা। এটিও সাদা জমিন বিশিষ্ট কাপড় ছিল।

শবনম ঃ

শবনমও অত্যন্ত মিহি বুননী বিশিষ্ট মসলিন। এ কাপড় এত পাতলা ছিল যে তাঁতিরা একে শবনম বা 'ভোর বেলার শিশির' নাম দিয়েছিল। শবনম মসলিন তৈরি হওয়ার পর ধোয়ার সময় সকাল বেলায় ঘাসের উপর শুকাতে দিলে শিশির এবং এর পার্থক্য বুঝা কষ্টকর ছিল এবং তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল শবনম। শবনমও সাদা জমিন বিশিষ্ট কাপড় ছিল এবং পরিধেয় জামা কাপড় তৈরির জন্য ব্যবহৃত হত। শবনম দৈর্ঘ্যে ২০ গজ চওড়ায় ১ গজ ছিল এবং এর সুতার সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত উঠানামা করত। সাধারণত একখানি শবনমের ওজন ছিল প্রায় ২০ থেকে ২২ তোলা।

আলিবালি ঃ

আলিবালি বা আলাবালি শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন। তাঁতিদের মতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার জন্য একে আলিবালি নাম দেওয়া হয়েছিল। এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ ও চওড়া ১ গজ ছিল এবং এর সুতার সংখ্যা ১১০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত উঠানামা করত। এর ওজন ছিল প্রায় ৪০ তোলা।

তন-জেব ঃ

ফার্সী শব্দ তন (দেহ) ও জেব (অলঙ্কার) থেকে তন-জেব শব্দের উৎপত্তি এবং এর মোটামুটি অর্থ দাড়ায় 'দেহের অলঙ্কার', বা 'দেহের সৌন্দর্য বর্ধক।' তন-জেবও সাদা জমিন বিশিষ্ট কাপড় ছিল এবং পরিধেয় জামা ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হত। এটি দৈর্ঘ্যে ২০ গজ ও প্রস্থে ১ গজ ছিল। এর সুতার সংখ্যা ৮০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত উঠানামা করত এবং এর ওজন ২০ থেকে ৪০ তোলা পর্যন্ত উঠানামা করত।

তরান্দাম ঃ

তরান্দাম শব্দ আরবী তরাহ্ (মত) এবং ফার্সী আন্দাম (দেহ) থেকে উদ্ভূত বলেই মনে হয়। এ হিসাবে বিচার করলে শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ হয়না, কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় শরীরের জন্য কাপড়, কিন্তু যে কোন কাপড়ই শরীরের জন্য। তবে এর অর্থ এই হতে পারে যে তরান্দাম শুধু পরিধেয় বস্ত্র বা জামা রূপেই ব্যবহৃত হত এবং এই সূত্রে অন্য কাপড় যেমন, সর-বন্দ (মাথা-বন্দ বা পাগড়ি) থেকে এর পার্থক্য বোঝায়। এটি দৈর্ঘ্যে ২০ গজ এবং চওড়া ১ গজ ছিল এবং এর সুতার সংখ্যা ২৭০০ পর্যন্ত থাকত। এর ওজন ৪০ থেকে ৮০ তোলা পর্যন্ত উঠানামা করত।

নয়ন-সুখ ঃ

নয়ন-সুখ শব্দ নয়ন (চক্ষু) এবং সুখ শব্দ থেকে উদ্ভূত। আইন-ই-আকবরীতে তন-সুখ (তন শব্দের অর্থ শরীর) নামে এক প্রকারের কাপড়ের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ আইন-ই-আকবরীর তন-সুখ ও পরবর্তী কালের নয়ন-সুখ একই কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এটি অত্যন্ত মিহি বুননীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং নয়ন-সুখ গলাবন্দ রুমাল (neck-kerchief) রূপে ব্যবহৃত হত। এটি দৈর্ঘ্যে ২০ গজ এবং চওড়ায় ১.৫ গজ ছিল। এর সুতার সংখ্যা ২২০০ থেকে ২৭০০ পর্যন্ত উঠানামা করত।

বদন-খাস ঃ

বদন শব্দের অর্থ শরীর। হয়ত এ জাতীয় মসলিন দ্বারা শুধু শরীরের জামা তৈরি হত বলেই একে বদন-খাস বলা হত। বদন-খাসও সূক্ষ্মতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এর বুনন খুব গাঢ় বুনটের (close texture) ছিলনা। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪ গজ পর্যন্ত ছিল এবং চওড়া ১.৫ গজ; এর সুতার সংখ্যা ছিল প্রায় ২২০০ এবং ওজন ছিল প্রায় ৩০ তোলা।

সর-বন্দ ঃ

ফার্সী শব্দ সর (মাথা) এবং বন্দ (বাঁধা) থেকে সর-বন্দ শব্দের উৎপত্তি। সর-বন্দ মাথার পাগড়িরূপে ব্যবহৃত হত। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৪ গজ পর্যন্ত ছিল এবং চওড়ায় ০.৫ থেকে ১ গজ পর্যন্ত ছিল। এর সুতার সংখ্যা ছিল প্রায় ২১০০ এবং ওজন ছিল প্রায় ৩০ তোলা। ইংরেজ কোম্পানী সর-বন্দ মসলিন বহুল পরিমাণে রপ্তানী করত এবং ইংল্যান্ডের মেয়েরা সর-বন্দ দ্বারা জামা, রুমাল বা গলাবন্দ (scarf) তৈরী করে ব্যবহার করত।

সর-বুটী ঃ

ফার্সী শব্দ সর (মাথা বা উপরিভাগ) এবং বুটী বা বুটীদার শব্দ থেকেই সর-বুটী নামের উৎপত্তি। এ জাতীয় মসলিনে কয়েক নাল সুতা মুচড়িয়ে বুটী গোটা তৈরি করা হত বলেই একে সর-বুটী নাম দেওয়া হয়েছিল। সর-বুটী ও পাগড়িরূপে ব্যবহৃত হত। এর পরিমাণ, ওজন এবং সুতার সংখ্যা সর-বন্দের মতই ছিল।

কামিছ ঃ

আরবী শব্দ কামিছ (জামা) থেকেই এ নামের উৎপত্তি। মুসলমানদের কোরতা তৈরির জন্য কামিছ মসলিন ব্যবহৃত হত। কোরতা ও জামার মত কিন্তু সে যুগে কোরতার দৈর্ঘ্য পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজকালও আরবী শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত ঐরূপ কোরতা ব্যবহার করে। কামিছ মসলিন দৈর্ঘ্য ২০ গজ ও চওড়ায় ১ গজ ছিল। এর সুতার সংখ্যা ছিল ১৪০০ এবং ওজন ছিল প্রায় ২৫ তোলা।

ডোরিয়া ঃ

ডোরা কাটা বা দাড় বিশিষ্ট মসলিনকে ডোরিয়া বলা হত। তাঁতে বুননের সময়েই দুই বা ততোধিক সুতা এক সাথে জোট পাকিয়ে ডোরা তৈরি করা হত। সাধারণত ভোগা বা সিরঞ্জ জাতীয় তুলা থেকেই ডোরিয়া তৈরি হত এবং এর দ্বারা ছেলেমেয়েদের পরিধেয় জামা তৈরি করা হত। ডোরিয়া দৈর্ঘ্যে ১০ থেকে ১২ গজ ও চওড়ায় ১ থেকে ১.৫ গজ পর্যন্ত ছিল। এর সুতার সংখ্যা ১৫০০ থেকে ২১০০ পর্যন্ত উঠানামা করত।

চার-কোণা ঃ

চার কোণা বিশিষ্ট ছককাটা বা চার কোণা ঘর বিশিষ্ট ডিজাইন করা মসলিনকে চার-কোণা বলা হত। চার-কোণা মসলিন দ্বারা জামা তৈরি হত। চার-কোণা এবং ডোরিয়া মসলিনের আকার, ওজন এবং সুতার সংখ্যা প্রায় সমান ছিল, পার্থক্য শুধু এই যে ডোরিয়ার ডোরা বা লাইনগুলি লম্বালম্বি ছিল আর চার-কোণা ছকগুলি চার কোণ বিশিষ্ট ছিল। হয়ত উভয় প্রকারের মসলিনের বুনন প্রণালীও একই ছিল।

জামদানী ঃ

যেসব মসলিন তাঁতেই নকশা করা হত, তাকে জামদানী বলা হত। জামদানী নানা প্রকারভেদ ছিল। জামদানীর দাম অত্যন্ত চড়া ছিল এবং দেশী বিদেশী ধনীদের কাছে জামদানীর বেশ চাহিদা ছিল। মোঘল বাদশাহদের জন্য তৈরি মলবুস খাসের একটি বিশিষ্ট অংশ তৈরি করা হত। আজকালও ঢাকায় জামদানী তৈরি করা হয় তবে এগুলো সেকালের জামদানীর নিকৃষ্ট সংস্করণ।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] ঃ

ঢাকাই মসলিন ইংরেজদের ব্যবসায়ে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। মসলিন উৎপাদন ও মসলিনের ব্যবসা সম্পর্কে এদের কোন কোন পুস্তকে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ পুস্তকগুলোর মধ্যে মসলিনের ইতিহাস জানার জন্য দু'টি বিশেষ সহায়ক বই, যথা: ১ম, জেম্‌স টেলরের A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca। এ বইটি ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হয়। জেম্‌স টেলর বেশ কয়েক বছর ঢাকায় বসবাস করেছিলেন এবং যেহেতু ঐ সময় পর্যন্ত ঢাকার মসলিন শিল্প সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, মসলিন শিল্পের সাথে গ্রন্থকারের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। ২য় বই হচ্ছে A Description and Historical Account of the Cotton Manufacture of a Dacca in Bengal. ঢাকাই মসলিন সম্পর্কে বিলাতের অধিবাসীকে সম্যকভাবে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে এ বইটি রচিত হয় এবং এ বইটিই ঢাকাই মসলিনের একমাত্র ধারাবাহিক ইতিহাস। এ বইটিতে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, জেম্‌স টেলর-ই ঐ গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়া Baines এর History of the Cotton Manufacture of Great Britain এবং Dr. Ure এর Cotton manufacture of Great Britain বইগুলোতেও ঢাকাই মসলিন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম রচিত " ঢাকাই মসলিন" একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ঢাকাই মসলিনের ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রকাশনাসমূহ ঢাকাই মসলিনের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পাওয়া যায় ঃ

১। ঢাকাই মসলিন, লেখক-ডঃ আব্দুল করিম, প্রকাশকাল, ১৯৬৫
২। A sketch of the Topography & statistics of Dacca - Jems Taylor(1840)
৩। A Description & Historical account of the cotton manufacturing of Dacca in Bangal. Jems Taylor (1851)
৪। Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol-vii
৫। Modern Reviewed April-1995
৬। Cotton Manufacturing of great Britain – Ure (1836)
৭। Muslin-Our Story, published bz: DRIK Dhaka.

ঝ) ঢাকাই মসলিনের প্রধান কাঁচামাল উৎপাদন এলাকা ঃ

মসলিন তৈরি করার জন্য দরকার হতো বিশেষ ধরনের তুলা, ফুটি কার্পাস। এ বিশেষ ধরনের কার্পাসটি জন্মাতো মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে। একদম ভাল মানের কার্পাস উৎপন্ন হত মেঘনার পশ্চিম তীরে। শ্রীরামপুর, কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর ইত্যাদি স্থানগুলো ফুটি কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজকের যে কাপাসিয়া নামটি আমরা জানি তা এসেছে এই কার্পাস হতে। মেঘনা এমনিতেই খুব বড় নদী, তার উপর সমুদ্রের কাছাকাছি আবার বর্ষাকালে নদীর দু'কূল ভেসে যেত। তার ফলে যে পলি জমতো তার কারণেই ফুটি কার্পাসের উৎপাদন খুব ভাল হতো এসব স্থানে। কিন্তু একজন কার্পাস চাষী একবিঘা জমিতে ভালমানের মসলিন তৈরির জন্য মাত্র ছয় কেজির মতো তুলা পেত। প্রকৃতপক্ষে তিতাবাদি, বাজিতপুর ধামরাই ও সোনারগাঁও এলাকায় উৎকৃষ্টমানের ফুটি কার্পাস তুলা উৎপন্ন হত। তাছাড়া কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজানগর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলপুরে ফুটি কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল।

ঞ) ঢাকাই মসলিন কাপড় উৎপাদন এলাকা ঃ

মসলিন তৈরির কাজটি ছিল ভীষণ জটিল, কঠিন ও সময়সাধ্য। ঢাকা জেলার তাঁত শিল্প ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জেম্স টেলর নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে ঢাকা জেলার প্রত্যেক গ্রামেই কম বেশী তাঁতের কাজ চলত, কিন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের মসলিন তৈরির জন্য কয়েকটি স্থান বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলো হচ্ছে- ঢাকা, সোনরাগাঁও, ধামরাই, তিতাবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর। তাছাড়া ডেমরা, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, বাহারক, চরপাড়া, বালটেক, নবীগঞ্জ এবং সাহাপুর প্রভৃতি স্থানেও ঢাকাই মসলিন তৈরী হতো।

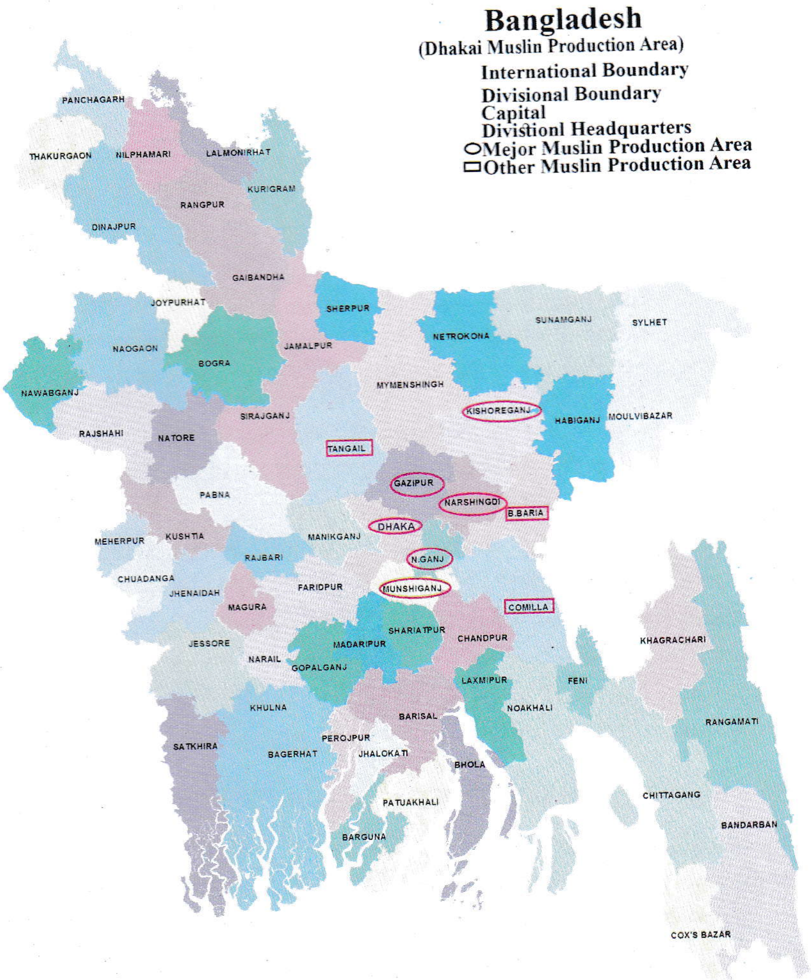

ট) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

ঢাকাই মসলিন বস্ত্র বয়নের তিনটি স্তর আছে- (১) কার্পাস উৎপাদন ও সংগ্রহ, (২) সুতা কাটা এবং (৩) কাপড় বয়ন। ঢাকাই মসলিনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কার্পাস উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে কাপড় তৈরি হওয়া পর্যন্ত সব স্তরেই ঢাকা স্বয়ংসম্পন্ন ছিল, বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ঢাকার মাটিতেই কার্পাস জন্মাত, ঢাকার তাঁতিরাই সুতা কাটত এবং বস্ত্র বয়ন করত। অনেক ক্ষেত্রে চাষী নিজেই তাঁতির কাজ করত এবং তাঁতি নিজেই ছুতার মিস্ত্রির কাজ করে নিজের তাঁত তৈরি করত। তাঁত তৈরির জন্য ও কোন বিদেশী জিনিসের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁতে ব্যবহারোপযোগী কাঠ ও বাঁশ ঢাকার বুকেই জন্মাত। সামান্য লোহার যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হলেও দেশজ লোহা তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল। তবে ঢাকার তাঁত এত সাধারণভাবে নির্মিত হত যে কাঠ ও বাঁশ এবং ছোট কয়েক টুকরা লোহা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁতের জন্য কোন দালান কোঠারও দরকার ছিল না। কারণ বছরের অর্ধেক সময় খোলা আঙিনাতেই তাঁতের কাজ চলত। প্রয়োজন অনুভূত হলে তাঁতির নিজ বাসগৃহে তাঁত সরিয়ে নেয়া বিশেষ দুরূহ কাজ ছিল না।

(১) কার্পাস উৎপাদন ও সংগ্রহ ঃ

মসলিন বুননের উপযোগী ফুটি কার্পাস ঢাকা জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই জন্মাত। ফুটি কার্পাস মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে সামান্য ভূ-ভাগেই ভাল জন্মাত। এ ভূ-ভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং তিতাবাদি (কাপাসিয়া), বাজিতপুর, ধামরাই ও সোনারগাঁও এলাকায় উৎকৃষ্টমানের ফুটি কার্পাস তুলা উৎপন্ন হত। তাছাড়া কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজানগর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলপুরে ফুটি কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জন টেলরের মতে, এ ভূ-ভাগে উৎপাদিত ফুটি কার্পাস পৃথিবীর যে কোন দেশে উৎপাদিত কার্পাস থেকে শ্রেয় ছিল। তাছাড়া লখ্যা নদীর তীর ঘেঁষে রূপগঞ্জ থানা এলাকায় প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগেও উৎকৃষ্ট ফুটি কার্পাস উৎপাদিত হত। ১৭৮৮ সালে ঢাকাস্থ ইংরেজ বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে ফুটি কার্পাস দ্বারাই ঢাকাই মসলিন তৈরি হত। ফুটি কার্পাস বীজ বছরে দু'বার বপন করা হয়, প্রথমত বসন্তকালে এবং দ্বিতীয়ত শরৎকালে। বসন্তকালের ফসল সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমানে কাপাসিয়া, নরসিংদী এবং রাজশাহীতে ফুটি কার্পাস তুলার চাষাবাদ করা হচ্ছে। ফুটি কার্পাস তুলা হাতে হার্ভেস্টিং এবং জিনিং প্রক্রিয়ায় বীজ হতে তুলাকে পৃথক করে সংগ্রহ করা হয়।

(২) সুতা কাটা (Spinning) ঃ

কার্পাস উৎপাদন ও সংগ্রহের পরের স্তর সুতা কাটা। প্রথমে তুলা ধুনে তার মধ্য হতে ময়লা, ধুলা-বালি দূর করা হয় এবং ফাইবারসমূহকে পৃথক করা হয়। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার সোনাপুর গ্রামে স্থানীয় চরকা দ্বারা হাতের মাধ্যমে মসলিনের সুতা কাটার কাজ চালু আছে। সেখানে মেয়েরা সুতা কাটায় নিয়োজিত আছে। তের বছর থেকে মধ্যবয়সী মেয়েরা সূক্ষ্মতম সুতা কাটায় বিশেষ পারদর্শী। কারণ, সূক্ষ্মতম সুতা কাটার জন্য দু'টি গুণের বিশেষ প্রয়োজন-১ম, প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও ২য়, হাতের আঙুলের প্রখর চেতনা শক্তি। এ কারণেই কম বা বেশী বয়সী মেয়েদের পক্ষে সূক্ষ্মতম সুতা কাটা সম্ভবপর নয়।

(৩) ঢাকাই মসলিন বয়ন ঃ

ঢাকাই মসলিনের উৎকর্ষ নির্ভর করত দেশজ কার্পাস বা নিপুণ সুতা কাটুনীদের উপর, কিন্তু তবু তাঁতিদের অবদান কোন অংশে কম নয়। উৎকৃষ্ট সুতা সংগ্রহ করে তাঁত থেকে কাপড় বের হওয়া পর্যন্ত আরও কয়েকটি স্তর আছে। এসব স্তরে সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন করার পেছনে তাঁতিদের অপরিসীম দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এসব স্তর হচ্ছে, ১। সুতা মাড়করণ (Sizing); ২। সুতা নাটান (Winding); ৩। টানা হোতান (warping); ৪। সান বাঁধা (applying the reed to the warp); ৫। ব-বাঁধা (preparing the heddles or harness); ৬। নারদ বাঁধা (beaming or applying the warp to the end roll of the loom) এবং ৭। কাপড় বুনা (weaving)।

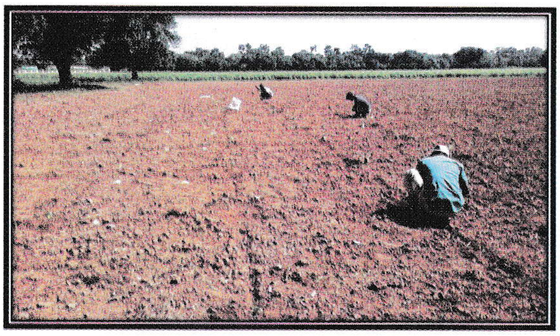

(ফুটি কার্পাস তুলার চাষাবাদ)

(ফুটি কার্পাস তুলার চারা গাছ)

(ফুটি কার্পাস তুলা গাছ)

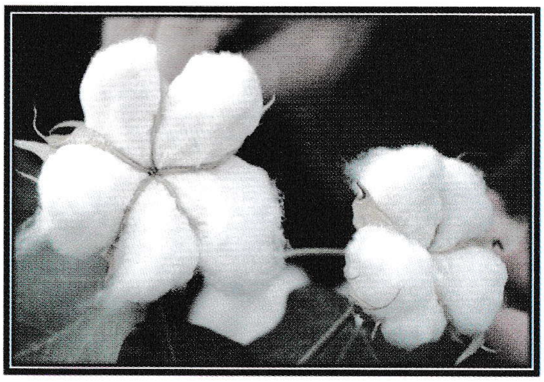

(ফুটি কার্পাস তুলা)

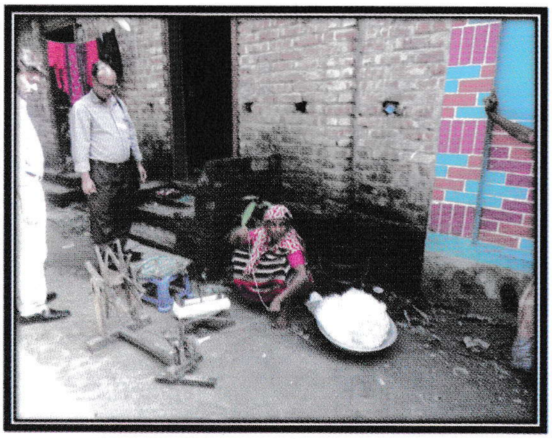

(সুতার লাছি/হ্যাংক তৈরি)

(সুতার মাড় প্রয়োগ)

(সুতা নাটাইকরণ)

(টানাকরণ)

(ব-বাঁধা)

(শানা গাঁথা)

(মসলিন বুনন প্রক্রিয়া)

ঠ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) ঢাকাই মসলিন হচ্ছে ফুটি কার্পাস (Gossypium Arboreum) তুলায় চরকার মাধ্যমে হস্তদ্বারা উৎপাদিত সুতা দিয়ে গর্ত (পিট) তাঁতে তৈরি এক ধরনের সূক্ষ্ম/পাতলা সুতি কাপড়।

(২) মসলিন ১০০% সুতি কাপড়।

(৩) মসলিন কাপড়ের সুতা চরকার মাধ্যমে হস্ত দ্বারা তৈরি হয় বিধায় তা অসমান।

(৪) মসলিন কাপড় খুবই মসৃণ, পাতলা, স্বচ্ছ ও ওজনে হালকা।

(৫) মসলিন কাপড় সহনীয় ও আরামদায়ক।

(৬) ঢাকার ফুটি কার্পাসের দ্বারা প্রস্তুত সুতা দ্বারা ঢাকাই মসলিন তৈরি হত এবং তা ধোয়ার ফলে ফুলে উঠত না বরং সংকুচিত হয়ে যেত। তাঁতিদের মতে, যে সুতা ধোয়ার সময় কম ফুলে ওঠে এবং বেশী সংকুচিত হয়, সে সুতা উত্তম। এ সুতায় প্রস্তুত কাপড়ের বুননী ঘন হয় এবং কাপড় অধিকতর টেকসই হয়।

(৭) মসলিন কাপড় শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ায় বিশেষভাবে উপযোগী।

(৮) মসলিন কাপড় সাধারণত সাদা ও অফ হোয়াইট রং এর হয়। তবে রঙিন, প্রিন্টেড এবং এমব্রয়ডারিয়েট হতে পারে।

(৯) মসলিন শাড়ি ছাড়াও ওড়না, স্কার্ফ, গাউন, পাগড়ি, শিশু ও মহিলাদের বিভিন্ন প্রকার পোশাক হতে পারে।

(১০) সূক্ষ্মতম মসলিন ব্যবহৃত সুতার প্রত্যেক নালের দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ হাত এবং ওজন ১ রতি।

(১১) জেমস টেলর এক পাউন্ড ওজনের একনাল সুতা দেখেছিলেন যার দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০ মাইল।

(১২) ঢাকাই ফুটি কার্পাসের আঁশ অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদিত কার্পাসের আঁশের চেয়ে সুক্ষ্মতর।

(১৩) জেমস টেলর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বলেছেন সে ঢাকাই মসলিনের একটি সুতা চুলের মত মনে হয় এবং এর ব্যাস ১/১০০০ থেকে ১/১৫০০ ইঞ্চি পরিমাণ।

(১৪) মোঘল আমলে এ কাপড় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল। এত সূক্ষ্ম যে এর ওজন ৬/৭ তোলার বেশী ছিল না এবং একে ছোট অঙ্গুরীয়ের ভিতরে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেত।

(১৫) ১৮৫১ সালে বিলেতের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে যে মসলিন খানি প্রদর্শন করা হয়েছিল তার ওজন ছিল আট তোলা।

(১৬) একটি জালী মসলিনে ১২০০ সুতা থাকত এবং এর দৈর্ঘ্য ২০ গজ ও চওড়া ১ গজ ছিল এবং ওজন প্রায় ২০ তোলা ছিল ।

(১৭) সরকার-ই-আলি নামধারী এক প্রকারের মসলিন অত্যন্ত মিহি, বুননী বিশিষ্ট ছিল এবং সুতার সূক্ষ্মতার জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। এর দৈর্ঘ্য ১০ গজ এবং চওড়া ১ গজ ছিল এবং সুতার সংখ্যা ছিল ১৯০০ এবং ওজন ছিল প্রায় ১০ তোলা।

(১৮) বৃহত্তর ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকার আবহাওয়া ও মাটির বৈশিষ্ট্য মসলিন সুতা উৎপাদনের ব্যবহৃত ফুটি কার্পাস চাষাবাদের উপযোগী ছিল এবং এখনও বিদ্যমান। বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা ছিল মসলিনের আদর্শ উৎপাদন অঞ্চল।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

SGS BANGLADESH LIMITED, ১১০ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, নূর টাওয়ার, ঢাকা-১২০৫ বাংলাদেশ পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ এই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের গুণগতমান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

ঢ) ব্যবহারকাল ঃ

১৯৬৫ সনে রচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম " ঢাকাই মসলিন" গ্রন্থে বলেছেন, আনুমানিক ১৫৫০ সালে অঙ্কিত দ্য বেরস এর মানচিত্রে সর্বপ্রথম ঢাকা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা নং-৯)। তিনি আরও বলেছেন, ঢাকার ইতিহাস চার'শ বছরের বেশি পুরানো নয়। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৬১০ সালে বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতী রাজমহল থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার পর থেকে ঢাকা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ মোঘল আমলের আগে পাওয়া যায় না (পৃষ্ঠা নং-৩)।" অপরদিকে তিনি বলেছেন, "সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির দলিল দস্তাবেজ এবং ঐ সময়কার ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি ঘটে এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মসলিন শিল্প একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় (পৃষ্ঠা নং-৫)।" ঢাকা জেলার তাঁত শিল্প উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জেমস্ টেলর (ইংরেজ বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারী) নিজের চোখে দেখেছেন (পৃষ্ঠা নং-১১)।" Texpedia (texpedia.org) থেকে জানা যায়, দালিলিকভাবে ১৬৭০ সালে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে মসলিন কাপড় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মসলিনের ব্যবহারকাল ১৬১০ হতে ১৮৫০ সন পর্যন্ত গণনা করা যেতে পারে।

ণ) অন্যান্য ঃ

মোঘল রাজশক্তির পতন, ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব, ঢাকাই মসলিনের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ ইত্যাদি কারণে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকাই মসলিন কাপড়ের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও মসলিন পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২.১০.২০১৪ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মসলিন তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য বিশ্বখ্যাত "মসলিন" তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৭.০১.২০১৬ তারিখের ২৪.০০.০০০০.১১৬.১৮. ০৮৭.১৫-০৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৭(সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকাই মসলিন এদেশের গর্বিত ঐতিহ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গবেষণার মাধ্যমে প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

চিত্র ঢাকাই মসলিনের নমুনা চিত্র

ঢাকাই মসলিনের নমুনা চিত্র-১

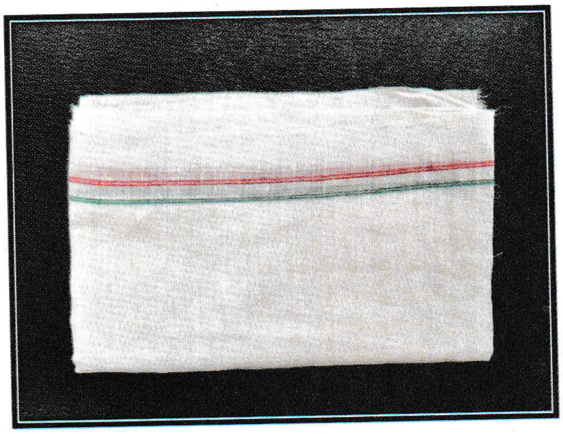

ঢাকাই মসলিনের নমুনা চিত্র-২

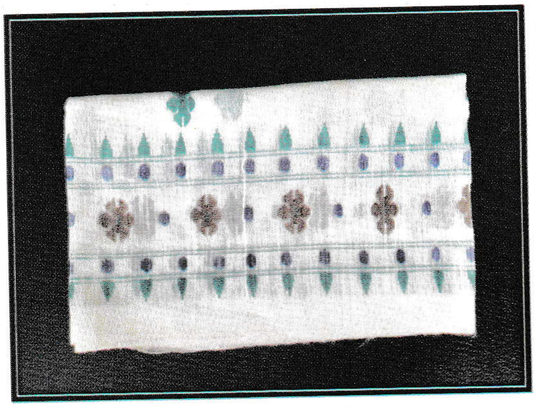

ঢাকাই মসলিনের নমুনা চিত্র-৩

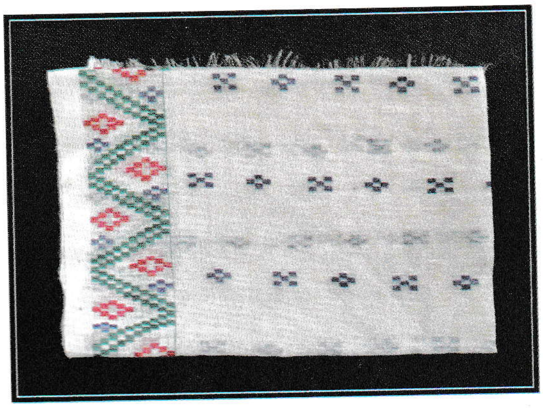

ঢাকাই মসলিনের নমুনা চিত্র-৪

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-প্রসেস শাখা-৬৯৯/২০-২১/শিল্প-১০-১২-২০২০-১২০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Md. Asaduzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Maksuda Begum Siddika, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.